দৈনিক খবর
তারিখ 10 DEC 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নারী শিক্ষা ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ঃ সমস্যা ও সমাধান

মোহাম্মদ হারুন–উর–রশীদ

আলোচ্য বিষয়বস্তু আপাতদৃষ্টিতে দু'টি পৃথক নিবন্ধের ব্যাপ্তি, বিচার এবং বিশ্লেষণ দাবী করলেও উল্লিখিত দু'টি বিষয়কে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং সার্বজনীন শিক্ষার প্রজাতি হিসেবে গণ্য করাই শ্রেয়। এখানে নারী শিক্ষা বলতে বিষয়টিকে মূলত প্রাথমিক শিক্ষার মতই সর্বজনীন শিক্ষার একটি দিক হিসেবে গণ্য করতে হবে। তা না হলে বিষয়বস্তু তার সংজ্ঞার স্বাভাবিকতায় সত্যি সত্যি দু'টি পৃথক নিবন্ধের পরিসর এবংমনোযোগদাবীকরবে।

১৯৮৭ সালে প্রকাশিত ইউনিসেফ–এর একটি প্রতিবেদনে বাংলাদেশের বর্ণনাটি শিক্ষাসহ আমাদের যে কোন উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এতে বলা হয়েছে যে, এ দেশে শতকরা ৮০টি গ্রামীণ বসতবাটিতে ব্যাপক দারিদ্র্য বর্তমান। প্রায় সত্তর লাখ লোক বেকার। পাঁচ বছরের নিচে শতকরা ৮৪টি শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে। এর জনসংখ্যা বাড়ছে বছরে ২৬% হারে। সর্বোপরি রয়েছে জাতীয় সম্পদের অপ্রতুলতা। জাতীয় আয়ের বন্টনেও বিপুল বৈষম্য– বিত্তের বিচারে উপরের ২০% লোক জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেক ভোগ করে অন্যদিকে নিচের দিকে ২০% লোক ভোগ করে জাতীয় আয়ের মাত্র ১০%। বিগত কয়েক দশকে পুষ্টির ক্ষেত্রে মারাত্মক অবনতি হয়েছে। জনসংখ্যার মাত্র ৫% লোক গুণগত মানের এবং পরিমাণে পর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। ফলে অপুষ্টিজনিত কারণে শিশুদের মোট সংখ্যার প্রায় অর্ধেকের দৈহিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে।

প্রতিবেদনটির ভয়াবহতার এখানেই শেষ নয়। বলা হয়েছে এই বৈষম্যজনক পরিস্থিতিতে শিশুরা, বিশেষ করে বালিকারাই হচ্ছে অসহায় শিকার। আগামী কয়েক বছরে যে চল্লিশ লাখ শিশুর জন্ম হবে তাদের মধ্যে পাঁচ লাখের মৃত্যু হবে তাদের জন্মের প্রথম বছরেই। পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে মারা যাবে আরো তিন লাখ। বাকী ৩২ লক্ষের এক–পঞ্চমাংশ, অর্থাৎ পাঁচ লাখের কিছু উপরে, অপুষ্টির বেড়াজাল অতিক্রম করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দোরগোড়ায় পৌছবে।

চিত্রটি কোন বাংলাদেশীর জন্যই সুখকর বিবেচিত হবার কথা নয়। দারিদ্র্য, বৈষম্য, অপুষ্টির এই সামগ্রিক চিত্রটির প্রেক্ষাপটে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণই সম্ভবতঃ একমাত্র সমাধান নয়। তবে প্রতিবেদনটির মতে শিক্ষা খাতে, বিশেষ করে শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে বিনিয়োগ, দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, জন্মহার রোধ এবং শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধিতে নাটকীয় পরিবর্তন সাধন করতে পারে।

বাংলাদেশের এই সামগ্রিক চিত্রটি বিস্মৃত হলে শিক্ষা সম্পর্কে কোন আলোচনাই অর্থময় হতে পারে না। এও মনে রাখতে হবে যে, ১৯৫১ সাল থেকে আরম্ভ করে সরকার ছয়টি শিক্ষা কমিশন/কমিটি নিয়োগ করেছেন– এর দু'টি পাকিস্তান আমলে এবং চারটি স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর। শিক্ষাকে একটি স্বাধীন দেশের উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে এ সমস্ত কমিশন/কমিটি সুপারিশ রেখেছে। প্রত্যেকটি কমিশন/কমিটির রিপোর্টেই প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন এবং বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এ ক্ষেত্রে আমাদের অর্জন এখনো জাতীয় লক্ষ্যের তুলনায় অতি সামান্যই। কিন্তু কেন? এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না দিতে পারলে এবং সে অনুযায়ী আমাদের সামগ্রিক প্রয়াসকে সমন্বিত না করতে পারলে ভবিষ্যৎ কার্যক্রমও অতীতের সমস্ত কার্যক্রমের মতই ব্যর্থ হতেবাধ্য।

আমার কাছে মনে হয়েছে এ দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে রাজনৈতিক ইচ্ছা এবং সামাজিক ইচ্ছার সমন্বয় কখনোই হয়নি। স্বাধীনতার পর গণসাক্ষরতা ও সর্বজনীন শিক্ষার ব্যাপারটি সাংবিধানিক স্বীকৃতি পেয়েছে।' এ লক্ষ্য অর্জনের সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনাও রয়েছে সংবিধানে। সংবিধানে ১৭ নং ধারায় বলা হয়েছে 'রাষ্ট্র (ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য; (খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত 'শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিরার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।' এছাড়া নারী–পুরুষের সমান অধিকারের বিষয়টিও সাংবিধানিকভাবেস্বীকৃত।

সংবিধানে স্বীকৃত এ অধিকার বাস্তবায়নের জন্য সরকার কর্তৃক ১৯৭৪ সালে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণ করা হয়। তাছাড়া এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশনে (১৯৭৪) নিম্নলিখিত সুপারিশ করা হয় ঃ

ক· প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষারূপে পরিগণিত করে তাকে সর্বজনীন করতে হবে।

খ· প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত যে অবৈতনিক শিক্ষা চালু রয়েছে তা ১৯৮০ সালের মধ্যে বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং ১৯৮৩ সালের মধ্যে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত চালু করতে হবে।

গ· এ নতুন শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষক, বইপত্র, শিক্ষা উপকরণ ও শ্রেণীকক্ষসহ পর্যাপ্ত সুবিধাদি সৃষ্টি করতে হবে।

ঘ· মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা উৎসাহিত করার জন্য মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে এবং মেয়েদের জন্য পৃথক স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ঙ· যেহেতু ৫ থেকে ১৩ বছর বয়সের বালক–বালিকা দারিদ্র্যজনিত কারণে দিনের বেলায় কোন না কোনরূপ অর্থ–উপার্জনের কর্মকান্ডে নিয়োজিত থাকে সেজন্য এদের শিক্ষার জন্য নৈশ স্কুলের বন্দোবস্ত করতে হবে।

চ· ছাত্র–ছাত্রীদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের নিরিখে তাদের উৎপাদনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা এবং তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক আবহ তৈরীর লক্ষ্যে ছাত্র–ছাত্রীদের অবস্থা এবং ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটি নতুন পাঠক্রম তৈরীকরা।

এছাড়াও এ শিক্ষানীতির আর একটি উদ্দেশ্য ছিল যা মূলতঃ রাজনৈতিকঃ একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনগণের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা। বলা বাহুল্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

১০–এর পাতায় দেখুন

দৈনিক খবর 19

তারিখ 10-DEC 1992 ১৪

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নারী শিক্ষা ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

৯ এর পাতার পর

(১৯৭৩-৭৮) এবং দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৯-৮০) এ লক্ষ্যের সন্তোষজনক বাস্তবায়ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কারণে সম্ভব হয়নি। এ দু'টি পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষার বরাদ্দ ছিল সমগ্র শিক্ষা বরাদ্দের যথাক্রমে ১৮·৮% এবং ১৫·৩%। কার্যত এ অপ্রতুল বরাদ্দের অর্ধেক অর্থও ব্যয় করা সম্ভব হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত অর্থ উচ্চ শিক্ষা খাতে স্থানান্তর করা হয়। ভৌত সুবিধাদি সৃষ্টির লক্ষ্যও অর্জিত হয়নি। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত মাত্র ১০,০০০ নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মিত হয় যা ছিল লক্ষ্যের অর্ধেক। এ পরিকল্পনার কোন বাস্তব ফল অপচয় রোধে প্রতিফলিত হয়নি। শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর বিশেষ করে মহিলা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কর্মসূচী লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি পৌঁছতে পারেনি। (gustavsson, S 1990)।

১৯৭৯ সালে জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা কাউন্সিল দেশব্যাপী জনমত সংগ্রহের পর সর্বজনীন শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু সুদূরপ্রসারী এবং বাস্তবমুখী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এতে বলা হয়, প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন, অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক হবে এবং ১৯৭৯ সালে প্রথম শ্রেণীর থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে পরবর্তী শ্রেণীগুলো অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ১৯৮৩ সাল নাগাদ এর পূর্ণ বাস্তবায়ন করা হবে।

এ সিদ্ধান্ত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু এ পরিকল্পনার কিছু তাৎপর্যপূর্ণ দিক ছিল। এই সর্বপ্রথম একটি সরকারী পরিকল্পনায় লক্ষ্য অর্জনে গণ-উদ্দীপনা সৃষ্টির কথা ভাবা হয়। অর্থাৎ প্রকারান্তরে স্বীকার করে নেয়া হয় যে সর্বজনীন শিক্ষার মত এমন একটি বৃহৎ কর্মকাণ্ডে জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যকীয়। হিসেব করে দেখা যায় যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী বালক-বালিকাদের সকলকে সর্বজনীন শিক্ষার আওতায় আনতে গেলে আরো ৩০,০০০ নতুন স্কুলগৃহ নির্মাণ করতে হবে এবং ১,৫০,০০০ নতুন শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। এ স্কুল গৃহগুলো নির্মিত হবে স্থানীয় শ্রম ও উদ্যোগে এবং এতে অস্থায়ী উপকরণ যেমন বাঁশ, বেত ইত্যাদি ব্যবহার করা হবে। দেড় লাখ শিক্ষক এই পরিকল্পনা মেয়াদে প্রতি বছর ৩০,০০০ করে নিযুক্ত হবেন এবং এরা স্থানীয় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী, সরকারী কর্মচারী, মাধ্যমিক স্কুলের উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী এমন কি প্রয়োজন হলে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মধ্য থেকে নিযুক্ত হবেন। এরা শিক্ষাকর্মী রূপে আখ্যায়িত হবেন এবং এদের উৎসাহিত করার জন্য মাসে অল্প টাকা (১০০ টাকা) সম্মানী হিসেবে দেয়া হবে। এই অস্থায়ী ব্যবস্থার শেষে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ করা হবে।

এছাড়া দারিদ্র্যকে শিক্ষা বিস্তারে একটি বাস্তব অন্তরায় হিসেবে গণ্য করে প্রয়োজনীয় সামাজিক সংস্কার যেমন ভূমি সংস্কার এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য পুঁজি সরবরাহের প্রস্তাব করা হয়। বলা হয় যে, এ না করলে স্কুলে ভর্তি না হওয়া কিংবা অপচয় রোধের মত সমস্যা থেকেই যাবে এবং সর্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্যমাত্রা কখনোই অর্জিত হবে না

এ পরিকল্পনায় একটি অভিন্ন পাঠক্রম- যা মাদ্রাসা, মক্তব, প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং কিন্ডারগার্টেন সব ধরনের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠানের বেলায় সমভাবে প্রযোজ্য হয়- তার প্রস্তাব করা হয়।

এই সঙ্গে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বয়স্ক শিক্ষাকেও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে একই সাথে প্রাধান্য দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়।

বলা বাহুল্য ১৯৮২ সালের পর যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটে কিংবা তারও পরে উপজেলা পদ্ধতির বিরোধিতার মুখে এ প্রস্তাবে উল্লিখিত তৃণমূল পর্যায়ের গণ-সমর্থন লাভ করা সম্ভব হয়নি। আর গণ-প্রস্তুতির উপর নির্ভরশীল এমন একটি পরিকল্পনা স্বাভাবিকভাবেই তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। তবু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারী পরিস্থিতির কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে, বিশেষ করে অর্থ বরাদ্দ এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সর্বজনীন শিক্ষার একটি দীর্ঘমেয়াদী (১৯৮০-২০০০) পরিপ্রেক্ষিত-পরিকল্পনার শুরু হয়। এতে ২০০০ সাল নাগাদ ৯১% প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপযোগী ছেলেমেয়েদের বাধ্যবাধকতা ছাড়া বিদ্যালয়ে আনতে হবে এমন প্রস্তাব করা হয়। এ প্রস্তাব বাস্তবায়ন করার জন্য ১৯৯০ সালেই এই প্রাথমিক বয়স্কদের ৭৫% জনের বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা ছিল যা বাস্তবে সম্ভব হয়নি। এ হার বর্ধিত হয়ে ২০০০ সালে ৯১%-এ যাওয়ার কথা ছিল। এ লক্ষ্যমাত্রার বাস্তব দিক ছিল এই যে, ১৯৯০-এর মধ্যে আরো ৪৯,০০০ শিক্ষক এবং ১,২৮,০০০ নতুন শ্রেণী কক্ষের প্রয়োজন হবে এবং এ সঙ্গে সাড়ে চার কোটি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রিত এবং সরবরাহ করতে হবে। এ পরিকল্পনার বাৎসরিক ব্যয়-বরাদ্দ প্রাক্কলিত হয় ২৮ কোটি ৪৫ লাখ টাকা অর্থাৎ পাঁচ বছরে যে অর্থের প্রয়োজন হত তা ছিল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বরাদ্দকৃত অর্থের দ্বিগুণ। সুতরাং এ উচ্চাভিলাষকে সংযত করা হয় সম্পদ এবং গ্রহণ ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কথা ভেবে। ঠিক করা হয় যে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে ৬০% জন ছেলেমেয়েকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা হবে এবং ২০০০ সাল নাগাদ এই হার দাঁড়াবে ৭৮%।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সর্বপ্রথম প্রাথমিক শিক্ষাখাত থেকে উচ্চ শিক্ষা খাতে অর্থ স্থানান্তরের রীতি রহিত করা হয়। এ পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত অর্থের ৪৬% দেওয়া হয় প্রাথমিক শিক্ষা খাতে। এ ছিল পূর্বের সর্বোচ্চ বরাদ্দের চেয়ে প্রায় তিনগুণ বেশি। এছাড়া এই সর্বপ্রথম সর্বজনীন শিক্ষার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। যদিও সম্পদের সীমাবদ্ধতা, শিক্ষকের অপ্রতুলতা, প্রশাসনিক দুর্বলতা এবং সঠিক মনোভাব ও উদ্দীপনার অভাবে এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি তবুও এ পরিকল্পনা মেয়াদে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারের বিষয়টি অনুভূত হয়েছে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে বরাদ্দের হার কমে ৪৫·৯৮%-তে দাঁড়ায়। তবে এ পরিকল্পনাতেও দীর্ঘমেয়াদী পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনার দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষের কাজ বাস্তবায়নের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষা খাতে বরাদ্দ রয়েছে ১১৬২·২৭ কোটি টাকা যা মোট শিক্ষা বরাদ্দের ৪৮·৯৮%। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলককরণ আইন, ১৯৯০ গৃহীত হয়েছে এবং সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী ইতিমধ্যে নির্ধারিত ৬৮টি এলাকায় ১৯৯১-৯৫ মেয়াদে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলককরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ পরিকল্পনা মেয়াদে বর্তমানে ভুক্তিকৃত ১১৪ লাখ শিশুর স্থানে ১৫৪ লাখ শিশুর বিদ্যালয় ভুক্তিকরণ সম্পন্ন করতে হবে। এর জন্য ১৯৯১ সালে প্রয়োজন হবে অতিরিক্ত ৪৪,২৬৬টি শ্রেণীকক্ষ এবং অতিরিক্ত ৪৪,২৬৬ শিক্ষক। এ সময়ে পৌর এলাকা বাদে সমগ্র বাংলাদেশে নারী শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ঘোষণা করা হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শ্রেণীকক্ষের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। সর্বোপরি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা একটি সামাজিক আন্দোলন রূপে গড়ে উঠবে।

একটি সাংবিধানিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বিগত দুই দশক ধরে সরকারের গৃহীত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করলাম এ জন্য যে, এই পটভূমিতেই চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার মূল কাঠামোতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

সরকারের এ সকল প্রয়াস সত্ত্বেও সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক চিত্রটি আশাব্যঞ্জক নয়। বিপুল বৈদেশিক সাহায্যের ফলে ১৯৮১-এর তুলনায় ১৯৮৬ সালে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পায় প্রায় ছয় গুণেরও বেশি। অথচ তার কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রভাব অনুভূত হয়নি। এ থেকে এই প্রমাণ হয় যে, অর্থাভাব শিক্ষা প্রসারে অন্যতম প্রধান অন্তরায় হলেও এই অন্তরায় দূরীকরণই সমস্যার একমাত্র সমাধান নয়। আশির দশকের শেষ নাগাদ বিদ্যালয় থেকে ঝরে-পড়া সংক্রান্ত অপচয় রোধে খানিক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। ১৯৯০ সাল নাগাদ বিদ্যালয় ত্যাগের হার ২২ শতাংশ থেকে কমে ১৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ব্যয়িত বিপুল সম্পদের তুলনায় সে অর্জন অতি সামান্য।

এ পর্যায়ে আমাদের সর্বজনীন শিক্ষার পথে সাংস্কৃতিক অন্তরায়গুলো কি তা খুঁজে বের করা প্রয়োজন। তাহলেই সম্ভবতঃ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সফল এবং নারী শিক্ষার পথ সুগম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এদেশে প্রাক-আর্যযুগে একটি দেশজ শিক্ষাপ্রণালী চালু ছিল এমন ধারণা করা একেবারে অমূলক বিবেচিত হবে না। আর্যরা এই আদি 'বাঙালদের' সংকর জাতি বলে হেয় জ্ঞান করতে এবং এদের প্রতিরোধের মুখে দীর্ঘদিন এ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি। আর্য আধিপত্য কায়েমী হলে এখানে আর্যদের প্রবর্তিত শিক্ষাপ্রণালী চালু হয়। এ শিক্ষা বর্ণাশ্রম ভিত্তিক এবং উচ্চ বর্ণের আর্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বৌদ্ধযুগে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সূচিত হলেও সেখানেও শিক্ষা বৌদ্ধ বিহারগুলোতেই সীমিত ছিল। শিক্ষার্থী ভুক্তিকরণের ব্যাপারে কোন অসম নীতি অনুসৃত না হলেও, শিক্ষায়তনের দুয়ার সমগ্র জনগোষ্ঠীর জন্য উন্মুক্ত করার উদ্যোগে কখনো নেওয়া হয়েছে বলে জানা যায় না। মুসলিম যুগেও উদার নীতির সম্প্রসারণ ঘটে বটে, তবে সেখানেও সর্বজনীন শিক্ষার কোন ধারণা ছিল না। মুষ্টিমেয় শিক্ষাপ্রাপ্ত আলেম সম্প্রদায় ও অন্যান্য শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রধানত রাজশক্তির সহায়ক শক্তি রূপেই কাজ করেছে। এছাড়া সর্বকালেই শিক্ষা এ দেশে ছিল গুরু ভিত্তিক- গুরুকে সন্তুষ্ট করেই কেবল তার কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করা যাবে এ ছিল শাশ্বত ধারণা। ফলে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের বিরুদ্ধে একটি শক্তি বরাবরই এদেশে সক্রিয় ছিল। শক্তিগুলো এখনো আমাদের সমাজদেহ থেকে বিলুপ্ত হয়নি। ইংরেজ আমলে ইংরেজি শিক্ষা লাভ করে যারা 'ভদ্রলোকের' মর্যাদায় অভিষিক্ত হলেন তারা কৃষক-মজুরদের শিক্ষা লাভের ব্যাপারটিকে সুনজরে দেখেননি। এ দেশের বিগত ৫০ বছরে বিপুল পটপরিবর্তন হয়েছে। সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন হয়েছে কিছুটা শিক্ষা এবং কিছুটা বিত্তের বিচারে। এদেশের উপর দিকের যে ২০% লোক জাতীয় আয়ের অর্ধেক ভোগ করে থাকেন তারা কখনোই চান না যে দরিদ্র জনগোষ্ঠী সাক্ষর হোক, শিক্ষা লাভ করুক এবং এই সাথে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য দরকষাকষির শক্তি অর্জন করুক। আজ সর্বজনীন শিক্ষার যে কোন প্রয়াসের অন্তরায় হচ্ছে এই সামাজিক শ্রেণীটি যারা বিগত অর্ধ শতাব্দীতে একেবারে তৃণমূল থেকে উঠে এসেছে। এছাড়া এদেশে বাংলা বা ইংরেজি শিক্ষার প্রতি জনগোষ্ঠীর নির্জ্ঞান মনে প্রোথিত যে প্রতিরোধ আছে তাও প্রতিকূল শক্তি হিসেবে কাজ করছে। ধর্মীয় শিক্ষা প্রসারের জন্য আমাদের উৎসাহ সে কারণে যতটা বেশি ততটা এই পার্থিব শিক্ষার জন্য নয়। এছাড়া এদেশে সর্বজনীন শিক্ষা প্রসারের আর একটি বড় অন্তরায় হচ্ছে নারীর প্রতি আমাদের প্রথাগত মনোভাব। দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। তাদের শিক্ষিত করে তোলার পথে সামাজিক প্রতিকূলতার অন্ত নেই। প্রথমতঃ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির অপব্যাখ্যার ফলে নারীকে কখনোই সামাজিক জীবনে প্রগতির সহায়ক শক্তিরূপে দেখা হয় না। নারী সাধারণ বিবেচনায় ভোগের সামগ্রী এবং তার অবস্থান পুরুষের নিচে। এ ধরনের মনোভাব শুধু অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে নয়, শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও ব্যাপক, ফলে মেয়ে ঘরে থাকলে পিতামাতার প্রথম বেং প্রধান চিন্তা হল মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত করা। অর্থাৎ যত শীঘ্র সম্ভব এ আপদ বিদায় করা। এর ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তা ভয়াবহ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভুক্তিকরণে বালক এবং বালিকার সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য বেশি নয়- ১৯৯০-এর হিসেব মোতাবেক যথাক্রমে ৫৬% ও ৪৫%। এই পার্থক্য উপরের শ্রেণীগুলোতে ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। মাধ্যমিক পর্যায়ে এ হার যথাক্রমে ৬৫% ও ৩৫%, উচ্চ মাধ্যমিক যথাক্রমে ৭২% ও ২৮%, বিশ্ববিদ্যালয়ে (সাধারণ) এ হার যথাক্রমে ৮০% ও ২০% প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাক্রমে ৯৪% ও ৬%, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯৩% ৩৭%।

অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভুক্তিকৃত ছাত্রীদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি অংশই উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পায়। এছাড়া গ্রাম ও শহর ভিত্তিক ভুক্তিকরণে নরনারীর সংখ্যায় অসমতা লক্ষ্য করা যায়। স্বাভাবিকভাবেই শহরের বালিকাদের সংখ্যা গ্রামের তুলনায় বেশি।

P.T.O.

দৈনিক খবর

20

তারিখ ... 10 DEC 1992
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৩ ...

সুতরাং আমাদের সংস্কৃতির মূলে প্রোথিত কিছু দুর্লংঘ্য দেয়াল ভাঙতে না পারলে নারী শিক্ষা তো বটেই সর্বজনীন শিক্ষা পরিকল্পনার পূর্ণ বাস্তবায়ন সুদূরপরাহত।

প্রথমতঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আকৃষ্ট করাটা একটা বিরাট সমস্যা। বাস্তব সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো সম্পর্কে ব্যবস্থা না নিয়ে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করলে তার পরিণাম ভাল হবার কথা নয়। এছাড়া যাদের জন্য শিক্ষা তাদেরও এ শিক্ষার প্রতি আস্থা নেই। সঙ্গত কারণেই নেই। কারণ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে ব্রিটিশ আরোপিত শিক্ষার উত্তরাধিকার এবং একটি বিশেষ 'ভদ্র শ্রেণী' সৃষ্টির যন্ত্র। এ যন্ত্র থেকে যারা শেষ পর্যন্ত বের হতে পারেন তাদের ঐ একটিমাত্র গুণ অর্জিত হয় তা হলো কলম পেশার উপযোগিতা অর্জন। জাতীয় প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিকল্পিত নয় বলেই এ সমস্ত ভদ্রলোকেরা হাতে ময়লা লাগবে কিংবা দুগ্ধ ফেননিভ সার্টের কলার মলিন হবে এমন কোন কাজ করতে নারাজ। ফলে ডাক্তারি পাস করে তাকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা হতে হয়। রসায়নে উচ্চ ডিগ্রী লাভ করে হতে হয় ব্যাঙ্কের কেরানী। আর চাকরি না পাওয়া গেলে বইতে হয় বেকারত্বের অভিশাপ। গ্রামের মানুষ এ শিক্ষাযন্ত্রটির প্রাথমিক স্তরের সঙ্গে সম্যক পরিচিত। এ যন্ত্রটির এমনই মাহাত্ম্য যে পঞ্চম শ্রেণী কোনক্রমে উত্তীর্ণ হলে শিক্ষার্থী কৃষিকর্ম বা অন্য কোন শ্রমভিত্তিক কাজ করাকে অসম্মানজনক মনে করে। ফলে এ ধরনের অল্প শিক্ষিত 'ভদ্র বাবুদের' সম্পর্কে গ্রামে প্রবাদ বাক্যের মত যে কথাটি চালু হয়েছে তা হলো এরা 'হালেরও না, জালেরও না। অর্থাৎ এরা পৈত্রিক পেশা বা অন্য কোন শ্রমনির্ভর কাজের উপযুক্ত না। ফলে দরিদ্র পিতা ছেলেকে হারাতে চান না, চান না ছেলে এমন নিষ্কর্মা 'ভদ্রলোক' হোক। আমাদের শিক্ষা মানুষকে তার পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং তাকে শ্রমবিমুখ উন্নাসিক করে এ সহজ সত্যটি গ্রামের মানুষ তার সজ্ঞান দিয়েই উপলব্ধি করেছে।

জনসংখ্যা বিশেষ করে গ্রামীণ জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ ভূমিহীন কিংবা প্রান্তিক চাষী। এদের দারিদ্র্য একটা বিরাট অন্তরায়, অতএব এদের জন্য শিক্ষাকে কোন না কোন কুটিরশিল্প বা ক্ষুদ্র প্রকল্প ভিত্তিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করতে হবে। প্রয়োজনে বোধে এ জনসংখ্যা থেকে আগত ছাত্রদের মাসিক হারে অর্থ সাহায্য দিতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণে উন্নয়ন বরাদ্দের ৮৬% অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। আমাদের উদ্দেশ্য ভবন নির্মাণ নয় মানব উন্নয়ন। সেটা কুঁড়েঘরেও সম্ভব যদি শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের মধ্যে কর্মসূচীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা থাকে।

ঠিক এ বিষয়টিই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল ১৯৭৯ সালে শহীদ জিয়াউর রহমান কর্তৃক নিযুক্ত জাতীয় শিক্ষা কাউন্সিলের সুপারিশে। বলা হয়েছিল বরাদ্দকৃত অর্থে অস্থায়ী ঘর নির্মাণ করা হবে স্থানীয় উপকরণের দ্বারা। স্থানীয় লোকদের বিপুলভাবে সম্পৃক্ত করার কথা বলা হয়েছিল জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে এই ব্যাপক শিক্ষা পরিকল্পনায়। সমস্ত পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের ভার যাদের উপর ছিল সে সমস্ত আমলাদের অনীহা এবং উচ্চ বিত্তের অদৃশ্য ষড়যন্ত্রের ফলেই এ পরিকল্পনাটি বিফলতায় পর্যবসিত হয়। তাছাড়া এ সময় জিয়াউর রহমান নির্মমভাবে নিহত না হলে এবং স্বৈরশাসক দেশের ক্ষমতায় না আসলে হয়ত এর ইতিহাস ভিন্নরকম হতে পারতো। দেশের ১,৭৫,০০০ প্রাথমিক শিক্ষক যদি দুই শিফটে কাজ করেন এবং এ ব্যাপারে যদি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি সহযোগিতা প্রদানে এগিয়ে আসে তাহলে বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিক্ষার্থীদের অন্য কোনরূপ অতিরিক্ত ভৌত সুবিধা সম্প্রসারণ ছাড়াই ৫-১০ বছরের সমস্ত শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আওতায় আনা সম্ভব।

সুতরাং একটা প্রবল রাজনৈতিক ইচ্ছা এবং এ ইচ্ছা বাস্তবায়নের অন্তরায় দূরীকরণে আপোষহীন পদক্ষেপ না নিলে প্রাথমিক শিক্ষা কিংবা নারী শিক্ষা সম্পর্কে কোন প্রয়াসই সফল হতে পারে না। এর জন্য দরকার একটা বিপুল গণউদ্বুদ্ধকরণ এবং স্থানীয় জনশক্তির স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। আমাদের দুর্ভাগ্য হচ্ছে জাতীয় জীবনের যে মুহূর্তে সমগ্র জাতি আধপেটা খেয়ে এমন একটা কাজে ব্রতী হতে পারতো, সে মুহূর্তটিকে অর্থাৎ স্বাধীনতা-উত্তর দিনগুলোকে আমরা নিজেদের সার্থকতার জন্য যথাযথ ব্যবহার করতে পারিনি। বলা বাহুল্য এমন একটি মুহূর্ত একটা জাতীয় জীবনে হাজার বছরেও একবার আসে না। সেই বিপুল গণউদ্দীপনা সৃষ্টি আবার কখন সম্ভব হবে তা জানি না।

সুপারিশ : সাধারণ

ক· প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে প্রাথমিক শিক্ষকের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিতে হবে। যে মানুষটির অবদান প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তার দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাকিস্তানী আমল থেকে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত এমন কোন বৃহৎ কার্যক্রম গৃহীত হয়নি যা উল্লেখের দাবী রাখে। স্বাধীনতা-উত্তরকালে দাতাসংস্থার বিপুল সাহায্য ব্যয় করা হয়েছে- উন্নয়ন খাতের ৯৬% খরচ হয়েছে ভবন ও ভৌত সুবিধাদির জন্য। এ তুলনায় প্রাথমিক শিক্ষকের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্যয় হয়েছে মাত্র ১%। ভৌত সুবিধা সৃষ্টির মাপকাঠিতে শিক্ষা উন্নয়নের পরিমাপ করার এ দুরারোগ্য প্রবণতা পাকিস্তানী আমল থেকে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যাহত করেছে।

খ· নিরক্ষরতা দূরীকরণসহ প্রাথমিক শিক্ষা ও নারী শিক্ষার পথে সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকগুলো দূর করতে হবে। এ প্রতিবন্ধকগুলোর কিছু ধর্মীয়, কিছু সামাজিক আর কিছু আমাদের গোষ্ঠীসৃতির একেবারে মূলে প্রোথিত। একটা সামাজিক বিপ্লব ছাড়া এ প্রতিবন্ধকগুলো অপসারণ করা যাবে না। এর জন্য প্রয়োজন গণচেতনা সৃষ্টির যার অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে গণমাধ্যমগুলোর মাধ্যমে সংগঠিত করতে হবে। এ সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকগুলো অপসারণের প্রয়াসের ব্যাপারটি পূর্ববর্তী কোন পরিকল্পনাতেই প্রাধান্য পায়নি। এ ব্যাপারে গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তিদের এবং আলেম সমাজের সক্রিয় সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

গ· বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে যে পাঠক্রম তা বৃহত্তর গ্রাম জীবনের জন্য উপযোগী নয়। এতে প্রথমত তিনটি ভাষার বোঝা শিশুকে বইতে হয়- যা তার স্বাভাবিক পাঠের আনন্দকে কেড়ে নেয়। পাঠ হয়ে উঠে একটি ঘর্মাক্ত অনুশীলনের ব্যাপার। সুতরাং প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজী ও আরবী ভাষা শিক্ষার ব্যাপারটিকে অন্যত্র সরিয়ে নিতে হবে। এর পরিবর্তে বাংলা ভাষা শিক্ষার সঙ্গে এমন সব ঐচ্ছিক বিষয় পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যা তার পরিবেশ এবং জীবনের উপযোগী- যেমন পশু পক্ষী পালন, পানি সেচ, উফসী পদ্ধতিতে শস্য উৎপাদন, মাছের চাষ, বসতবাটির চতুর্দিকে তরিতরকারী উৎপাদন, কামারের কাজ, মৃৎপাত্র তৈরী, দেশীয় পদ্ধতিতে বস্ত্রের রঙ তৈরী। গ্রামে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত এসব প্রকল্পে ছাত্রদের হাতে কলমে শিক্ষার জন্যও একাডেমীক কৃতিত্ব দেয়া যেতে পারে। এ ব্যবস্থায় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কিছু উপার্জনের ব্যবস্থা হতে পারে যা দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখার জন্য অনুকূল বিবেচিত হতে পারে।

ঘ· সুতরাং পাঠক্রম যেমন পরিবর্তন করা প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন পরীক্ষা পদ্ধতি সংশোধনের। শিক্ষকের সারা বছরের মূল্যায়নই পর্যাপ্ত বিবেচিত হওয়া উচিত। উচ্চতর শ্রেণীতে উত্তরণের জন্য কোন পরীক্ষা নেয়া হবে না। শিক্ষক শুধমাত্র তাকে সারা বছরের মূল্যায়নের ভিত্তিক গ্রেড দেবেন (যেমন ক, খ, গ ইত্যাদি)। পাস ফেলের এবং মেধা তালিকা প্রণয়নের প্রথা রহিত করতে হবে। এর ফলে শিক্ষার্থীর পরীক্ষা ভীতি থাকবে না এবং শিক্ষকের বাড়ি কেন্দ্রিক যে প্রাইভেট পড়ার রীতি চালু হয়েছে তার অবসান ঘটবে।

ঙ· প্রাথমিক শিক্ষাকে সত্যিকার অর্থে অবৈতনিক করতে হবে। আনুষঙ্গিক ফিস গ্রহণ অবৈধ ঘোষণা করতে হবে। এ ফিস গ্রহণের মূলে যে অলিখিত দুর্নীতির ইতিহাস রয়েছে তাও নির্মমভাবে রোধ করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণের পর-এ চাকরি পেতে হলে শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়াও প্রার্থীর সেলামি দেবার মত আর্থিক সঙ্গতিও বিচার্য বিষয়রূপে অলিখিতভাবে স্বীকৃত হয়ে আসছে। এ প্রথার বিলোপ সাধন প্রয়োজন। এছাড়া বিনামূল্যে সরবরাহকৃত পাঠ্যপুস্তক যে কোন ক্ষেত্রে মূল্যের বিনিময়ে কিনতে হয় সে প্রথার বিরুদ্ধেও যথাযোগ্য ব্যবস্থা নিতে হবে

চ· একটা ব্যাপক গণউদ্দীপনা সৃষ্টির মাধ্যমে সমগ্র জাতিকে এ কার্যক্রমের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। এতে স্থানীয় জনসাধারণ ও প্রশাসনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণের ফলে শিক্ষক নিজেকে সরকারী চাকুরে ভাবতে শুরু করেছেন এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে কোন প্রকারে সন্তুষ্ট রাখতে পারলেই তার দায়িত্বের জন্য আর কারো কাছে জবাবদিহির প্রয়োজন মনে করেন না। স্থানীয় কমিটির কাছে জবাবদিহির ব্যবস্থা হলেই এ অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব। এছাড়া শিক্ষক ও অভিভাবকদের মিলিত কমিটি সৃষ্টির মাধ্যমেও শিক্ষা কার্যক্রমের মূল্যায়ন ও অগ্রগতি সাধন সম্ভব। উপজেলা শিক্ষা অফিসার প্রথাগত নিয়মে সরকারী দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে নিজ এলাকায় এ উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচীর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন।

ছ· মহিলা শিক্ষক নিয়োগকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বর্তমানে প্রাথমিক পর্যায়ে মাত্র ২০% শিক্ষিকা রয়েছেন। এ সংখ্যা বাড়াতে হবে। মেয়েদের জন্য স্কুল পোশাক দিতে হবে এবং স্কুল সংলগ্ন স্থানে শৌচাগার নির্মাণ করতে হবে।

জ· স্কুল ভবন নির্মাণে ঠিকাদারী প্রথার পরিবর্তে স্থানীয় উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে। স্থানীয় উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য সরকারী অনুদান থাকতে পারে। এ ব্যাপারে স্থানীয় বিত্তশালী ব্যক্তিদের সহযোগিতা কামনা করা যেতে পারে।

ঝ· মাদ্রাসা, মক্তব এবং গ্রামের মসজিদগুলোকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। মাদ্রাসা ও মক্তবের পাঠক্রমকে প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য ঢেলে সাজানো যেতে পারে এমনভাবে যাতে শিক্ষার্থী সমাজের পরগাছা না হয়ে উৎপাদিকা শক্তি হিসেবে গড়ে উঠে। এটা করতে পারলে নতুন ভবন নির্মাণে যে বিপুল অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় তার দরকার হবে না। এতে যে অর্থের সাশ্রয় হবে তা বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুদের অভিভাবকদের গ্রামীণ অর্থনৈতিক প্রকল্পে সম্পৃক্ত করার কাজে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

ঞ· প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র পাঠান এমন প্রতি ১০০ জন অভিভাবককে গ্রামাঞ্চলে সংগঠিত করে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ছোট ছোট খামার বা কুটির শিল্প প্রকল্পে পুঁজি দানের নিশ্চয়তা দিলে

চলবে